মৌলিক ইবাদাতসমূহ

ভূমিকা

মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির সেবা জীব। মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য অতি মহৎ। আর সে মহৎ কাজটি হল মহান আল্লাহ তাআলার ইবাদাত করা।

আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন ও নৈকট্য লাভ হচ্ছে ইবাদাতের মূল উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যাবতীয় উত্তম কাজই হল ইবাদাত। তিনি একমাত্র মাবুদ। আমরা তাঁর আব্‌দ বা বান্দা। আবদের কাজ হচ্ছে মাবুদের ইবাদাত করা। ইসলামে কতকগুলো মৌলিক ইবাদাত আছে। যেমন- সালাত, সাওম, হাজ্জ, যাকাত ইত্যাদি। এ ইউনিটে এসব বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এ ইউনিটের পাঠগুলো হলো-

পাঠ-১ : ইবাদাতের পরিচয় ও গুরুত্ব

পাঠ-২ : সালাতের গুরুত্ব ও শিক্ষা

পাঠ-৩ : যাকাতের গুরুত্ব ও শিক্ষা

পাঠ-৪ : যাকাতের নিসাব ও ব্যয়ের খাত

পাঠ-৫ : সাওমের গুরুত্ব ও শিক্ষা

পাঠ-৬ : হাজ্জের গুরুত্ব ও শিক্ষা

পাঠ ১ ইবাদাতের পরিচয় ও গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- ইবাদাতের অর্থ বলতে পারবেন;
- ইবাদাতের সংজ্ঞা দিতে পারবেন;
- ইবাদাতের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

১.১ ইবাদাতের পরিচয়

মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির সেবা জীব। মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য অতি মহৎ। আর সে মহৎ কাজটি হল মহান আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত করা। আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে তাঁর ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে আল্লাহ বলেছেন : "আমি জ্বিন ও মানব জাতিকে একমাত্র আমার ইবাদাতের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি।" (সূরা যারিআত : ৫৬)

আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন ও নৈকট্য লাভ হচ্ছে ইবাদাতের মূল উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যাবতীয় উত্তম কাজই হল ইবাদাত। তিনি একমাত্র মাবুদ। আমরা তাঁর আব্‌দ বা বান্দা। আবদের কাজ হচ্ছে মাবুদের ইবাদাত করা। ইসলামে কতকগুলো মৌলিক ইবাদাত আছে। যেমন- সালাত, সাওম, হাজ্জ, যাকাত ইত্যাদি।

১.২ ইবাদাতের সংজ্ঞা

ইবাদাত আরবি শব্দ। এর অর্থ দাসত্ব করা, বন্দেগী করা, আনুগত্য করা, উপাসনা করা, স্তব-স্তুতি করা, আরাধনা-অর্চনা করা।

ইসলামের পরিভাষায় আল্লাহর বান্দা হিসেবে আমরা তাঁরই সন্তুষ্টি লাভের আশায় তাঁরই প্রেরিত নবীর প্রদর্শিত পথে যে কাজ করি তাই ইবাদাত। আল্লাহর প্রতি মানুষের যে সব দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে তা পালন করাই ইবাদাত। মূলত আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন হল ইবাদাতের মূল লক্ষ্য। সুতরাং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যে কোন কাজই ইবাদাত। মোদ্দাকথা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স) কর্তৃক নির্দেশিত পথের সমস্ত কাজই ইবাদাত।

১.৩ মানবজীবনে ইবাদাতের গুরুত্ব

ক. ইবাদাতের জন্যই মানুষের সৃষ্টি

আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন ও পালন করছেন। তাঁরই হাতে রয়েছে আমাদের জীবন-মরণ। তিনিই আমাদের মালিক-মনিব, প্রভু। আমরা তাঁর বান্দা। আমাদের কাজ হল তাঁর হুকুমমত চলা ও তাঁরই ইবাদাত-বন্দেগী করা। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁরই ইবাদাত-বন্দেগীর জন্য সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"আমি জ্বিন ও মানুষকে শুধু আমার ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছি।" (সূরা যারিআত : ৫৬)

খ. আল্লাহর ইচ্ছার বাস্তবায়নই ইবাদাত

আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টির সেরা জীব হিসাবে অতীব সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন। আমরা আল্লাহর অগণিত নিয়ামতরাজির মধ্যে ডুবে আছি। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁরই প্রতিনিধি করে এ দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। তাই আমরা আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে একমাত্র তাঁরই আদেশ-নিষেধ মেনে চলব, তাঁরই নিয়মমত পৃথিবীকে চালাব, এটাই আমাদের কাছে আল্লাহর দাবি।

গ. ইবাদাত কেবল আল্লাহর জন্যই

মহাবিশ্বের সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, নিয়ন্ত্রণকারী একমাত্র আল্লাহ। তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতায় আর কারও অংশীদারিত্ব নেই, তার সমকক্ষও কেউ নেই। তাই ইবাদাত করতে হবে একমাত্র তাঁরই জন্য। আল্লাহ বলেন - "তারা তো কেবল এ জন্যেই আদিষ্ট হয়েছে যে, আল্লাহর জন্যে একান্তভাবে দাসত্ব ও গোলামী করবে।" (সূরা বায়্যিনাহ : ৫)

ঘ. বান্দার সকল কাজই ইবাদাত

ইবাদাত মানে শুধু উপাসনা বা আধ্যাত্মিক ইবাদতকে বুঝায় না। আল্লাহর নির্দেশিত পথে মুমিনের সকল কর্মকাণ্ড ইবাদাতের শামিল। আল্লাহর ঘোষণা থেকে তাই বুঝা যায়। তিনি বলেন : "সালাত আদায় করার পর ভূ-মণ্ডলে ছড়িয়ে পড়, আর আল্লাহর অনুগ্রহের সন্ধানে ব্যাপৃত হও।" (সূরা জুমুআ : ১০)

ঙ. ইবাদাত সার্বক্ষণিক ভাবে আল্লাহর জন্য

মানুষ যাতে জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুম মানার যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম হয়; সে জন্য আল্লাহ তা'আলা দয়া করে আমাদের জন্য সালাত, সাওম, যাকাত ও হাজ্জের মত চারটি বুনিয়াদী ইবাদাত বাধ্যতামূলক করেছেন। নির্দিষ্ট সময়ে এই ইবাদাতগুলোর মাধ্যমে আমরা সর্বক্ষণের জন্যে আল্লাহর ইবাদাত করার এবং ইবাদাতে নিয়োজিত থাকার যোগ্যতা অর্জন করতে পারি।

চ. সকল নবী ইবাদাতের প্রতি আহ্বান করেছেন

পৃথিবীতে যত নবী-রাসূলের আগমন ঘটেছে, সবাই আল্লাহর ইবাদাতগুযার বান্দা ছিলেন। যেমন- আল্লাহ বলেন : "তারা সবাই আমার ইবাদাত গুযার বান্দা ছিলেন।" (সূরা আম্বিয়া : ৭৩)

আর সকল নবী-রাসূলের একই আহ্বান ছিল- "তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং তাগুতকে পরিত্যাগ কর।"

ছ. দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তির জন্য ইবাদত

মানুষের পার্থিব জীবনে সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য যেমন আল্লাহর ইবাদত করা এবং তারই হুকুম আহকাম মেনে চলা অপরিহার্য তেমনি পরকালীন জীবনে জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও নাজাতের জন্য এবং জান্নাতের অনন্ত সুখ-শান্তি র জন্য ইবাদাত বন্দেগী করা প্রতিটি মানব সন্তানের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য।

আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (স) প্রদর্শিত পথে চলাই ইবাদাত। এভাবে আমরা যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশিত পথে চলি তাহলে তিনি সন্তুষ্ট হবেন। আমাদের তিনি পুরস্কৃত করবেন। দুনিয়া ও আখিরাতে আমরা পাব অনাবিল সুখ আর শান্তি।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৮.১

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

এক কথায় উত্তর দিন–

১. সৃষ্টির সেরা জীব কি?
২. মানুষকে কোন মহৎ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে?
৩. ইবাদাত মানে কী?
৪. মৌলিক ইবাদাত কী কী?
৫. আমাদেরকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে?
৬. মানব ও জ্বিন জাতিকে কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে? এ সম্পর্কিত কুরআনের ঘোষণা লিখুন।
৭. বান্দার সকল কাজ কি?
৮. সার্বক্ষণিক ইবাদাত বলতে কি বুঝায়?
৯. সকল নবী কিসের প্রতি আহ্বান করেছেন?
১০. দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তির অন্য কি করতে হবে?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. ইবাদাত কাকে বলে?
২. মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করুন।
৩. ইবাদাতের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন।
৪. "ইবাদাত হতে হবে সার্বক্ষণিক আল্লাহর জন্য"- ব্যাখ্যা করুন।

সালাতের গুরুত্ব ও শিক্ষা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- সালাত কাকে বলে বলতে পারবেন;
- সালাতের গুরুত্ব বুঝাতে পারবেন;
- সালাতের ধর্মীয় গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;
- সালাতের সামাজিক শিক্ষার বিবরণ দিতে পারবেন।

২.১ সালাতের পরিচয়

ইসলামী জীবন ব্যবস্থা পাঁচটি মৌল স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। সালাত সেই পঞ্চ স্তম্ভের মধ্যে দ্বিতীয় স্তম্ভ। ঈমানের পরই ইসলামের প্রধান স্তম্ভ হচ্ছে সালাত। সালাত একটি শ্রেষ্ঠ ইবাদাত। ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় সালাতের গুরুত্ব অপরিসীম।

সালাত আরবি শব্দ-এর অর্থ– দু'আ, প্রার্থনা, সান্নিধ্য। যেহেতু নামাযে দুআ ও প্রার্থনা রয়েছে এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি হয় ও তাঁর সান্নিধ্য পাওয়া যায়, সেহেতু নামাযকে আরবিতে সালাত বলা হয়।

২.২ সালাতের ধর্মীয় গুরুত্ব

ইসলাম যে পঞ্চ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তন্মধ্যে সালাতের স্থান দ্বিতীয়। ইসলামে সালাতের গুরুত্ব এতই বেশি যে সালাত ব্যতীত ইসলামের কল্পনাই করা যায় না। যে সালাত পরিত্যাগ করে সে যেন ইসলামকেই ধ্বংস করে ফেলে। সালাত ত্যাগ করা কুফরেরই নামান্তর। সালাত সর্বোত্তম ইবাদাত। সালাতই বেহেশতের চাবি। সালাত মুমিনের জন্য দুনিয়াতেই মিরাজ স্বরূপ। আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি সালাতের মাধ্যমেই হয়। সালাতের সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম। সালাত মানবসমাজে সাম্য, শৃঙ্খলা সময়ানুবর্তিতা, নিয়মানুবর্তিতা, নেতৃত্ব নির্বাচন, আনুগত্য ইত্যাদি শিক্ষা দেয়। অতএব ইসলামে সালাতের ধর্মীয় এবং সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম।

দাসত্বের প্রকাশ : সালাতে মহান স্রষ্টা আল্লাহর ও বান্দার মধ্যে আনুগত্য, দাসত্বের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হয় যা অন্য কোন ইবাদাতে হয় না। সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে বান্দার ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মহানবী (স) বলেছেন : "নামায মুমিনের মিরাজ স্বরূপ"। হাদিসে কুদ্‌সীতে আছে। আল্লাহ বলেন : "বান্দা যখন সিজদা করে তখন আমি তার সবচেয়ে নিকটবর্তী হই।" নামাযের মাধ্যমে নামাযী ব্যক্তি জান্নাত লাভ করবেন। কেননা নামায হল বেহেশতের চাবি। মহানবী (স) বলেন-"নামায বেহেশতের চাবি।" নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলাকে অত্যধিক স্মরণ করার সুযোগ হয়। যে ব্যক্তি যত অধিক নামায আদায় করে সে তত বেশি আল্লাহকে স্মরণ করে।

মুমিন ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ক : ইসলাম ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য করার প্রধান উপায় হচ্ছে সালাত। মহানবী (স) বলেছেন : "মুসলিম ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী বস্তু হলো নামায বর্জন করা।" নামায হচ্ছে ঈমানের বাহ্যিক প্রকাশ। যে ঠিকমত নামায আদায় করে সেই প্রকৃত মুমিন। নামায আদায় না করে কেউ মুমিন হতে পারে না। মহানবী (স) বলেন- "যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ছেড়ে দেয় সে কাফির হয়ে যায়।"

মহানবী (স) বলেছেন : "নামায দ্বীনের স্তম্ভ, যে ব্যক্তি নামায প্রতিষ্ঠা করে সে ইসলাম ধর্মকেই প্রতিষ্ঠিত করল। আর যে ব্যক্তি নামায ত্যাগ করল সে যেন ইসলামকেই ধ্বংস করে ফেলল।"

সর্বোত্তম নেক আমল : মহানবী (স)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, কোন কাজ সর্বোত্তম? উত্তরে তিনি বলেন: "সময়মত নামায পড়াই হল সর্বোত্তম কাজ।" নামায মানুষের দেহ-মনকে সকল প্রকার পাপ ও পংকিলতা হতে মুক্ত করে। মহান আল্লাহ বলেন-"নিশ্চয় নামায মানুষকে অশ্লীল ও গর্হিত কাজ হতে ফিরিয়ে রাখে।"

নামাযে মানসিক পরিশুদ্ধি ঘটে এবং প্রশান্তি লাভ হয়। কেননা নামাযের জন্য পবিত্রতা অর্জন পূর্বশর্ত। আর নামায আদায় করতে বাহ্যিক পবিত্রতা তথা উযু ও গোসল করে দৈহিক পবিত্রতা অর্জন করতে হয়। তারপর জায়নামাযে দাঁড়িয়ে انى وجهت (ইন্নী ওয়াজ্‌জাহ্‌তু) দুআর মাধ্যমে মন হতে সকল প্রকার পার্থিব লোভ লালসা, হিংসা-দ্বেষ, ইত্যাদি মানসিক পাপ হতে ও মনকে পবিত্র করে। মহান আল্লাহ বলেন-

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

"যে সকল মুমিন নামাযে বিনয়াবনত তাদের জীবন সাফল্যমণ্ডিত।" (সূরা মুমিনুন : ১-২)

২.৩ সালাতের সামাজিক শিক্ষা

সালাত ব্যক্তিগত ইবাদাত হলেও সমাজের উপর এর বিরাট প্রভাব পড়ে। সালাতের সামাজিক শিক্ষার কিছু দিক তুলে ধরা হলো :

ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করে : একত্র হয়ে জামায়াতের সাথে সালাত আদায় করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামায়াতে পড়ার কারণে মুসল্লীগণ দৈনিক পাঁচবার একত্রে মিলিত হওয়ার সুযোগ পায়। ফলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত হয়। একে অপরের সুবিধা-অসুবিধা ও রোগ-শোকের কথা জানতে পারে এবং তা নিরসনের ব্যবস্থা করতে পারে।

সাম্য প্রতিষ্ঠা : সালাতে দাঁড়াবার সময় কারো জন্য পূর্ব নির্ধারিত স্থান বরাদ্দ থাকে না। ফলে ধনী-গরিব, বাদশাহ ফকির, চাকর-মনিব, বিদ্বান- মূর্খ, সাদা-কালো নির্বিশেষে সকলেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এক কাতারে দাঁড়ায়। এতে শ্রেণী বৈষম্য দূর হয় এবং অনুপম সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা : সালাতের ওয়াক্ত হলে একই সময়ে আযান, একই সময়ে সালাত এবং একই সময়ে ইমামের পেছনে সালাত আদায়ের ফলে শৃঙ্খলা বোধ ও সময়ানুবর্তিতা জন্ম লাভ করে। সামাজিক কোন সমস্যা সবাই মিলে সমাধান করার শিক্ষা পাওয়া যায়। আদর্শ সমাজ গঠনের প্রেরণা জাগ্রত হয়।

নিয়মানুবর্তিতা : সালাত আদায় করতে একই সাথে নিয়ত করা, তাকবীরে তাহরিমা বাঁধা, একই সাথে রুকু সিজদা করা, একই সাথে সালাতের কার্যাবলি ইমামের পেছনে আদায় করতে হয়। এতে নিয়মানুবর্তিতা অনুশীলন করার শিক্ষা পাওয়া যায়।

নেতা নির্বাচন : সালাতে একজন ইমাম নির্বাচন করতে হয়। খোদাভীরু ও সর্বজন সমাদৃত ব্যক্তিকেই ইমাম নির্বাচন করতে হয়। এ সময়ে কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় না। জোরপূর্বক কিংবা অযোগ্য লোককে ইমাম নির্বাচন করা যায় না। কাজেই সালাতের মাধ্যমে সমাজে নেতা নিবাচন ও কর্তব্যপরায়ণ হওয়ার শিক্ষা পাওয়া যায়।

জামাআতবদ্ধ জীবন : সালাত একাকী আদায় করা ঠিক নয়। জামায়াতের সাথে সালাত আদায় করতে হয়। এতে সমাজের মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠে ঐক্য, সংহতি, সংঘবদ্ধ জীবনবোধ এবং জামায়াতী জিন্দেগীর নিয়ম কানুন। ফলে সংঘবদ্ধ জীবন পরিচালনায় উদ্বুদ্ধ হওয়া যায় সাপ্তাহিক জুমআর সালাত ও বছরে দুটি ঈদের সালাত আরোও বৃহত্তর অঙ্গনে ঐক্য গড়ে তোলার প্রেরণা জাগে।

কল্যাণকর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা : কুরআনে ইসলামী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মধ্যে সালাত কায়েম করার কথা বলা হয়েছে। একজন মুসলিম ব্যক্তির যেমন প্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সালাত কায়েম করা, ঠিক তেমনি গোটা ইসলামী রাষ্ট্রেরও সর্বপ্রথম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল সমগ্র রাষ্ট্রে সালাত আদায়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থা কার্যকর করা। যে লোক সালাত পড়ে না, সে যেমন দ্বীন ইসলাম পালন করে না, তেমনি যে রাষ্ট্রে বা সরকার সালাত কায়েমের ব্যবস্থা করে না, সেটাও ইসলামী রাষ্ট্র নয়।

দৈহিক ও মানসিক সুস্থতা : দৈনিক পাঁচ বার সালাত আদায় করার জন্য উত্তম রূপে পাক পবিত্র হতে হয়। অযূ-গোসল করতে হয়। অযূর পূর্বে মিসওয়াক করা সুন্নাত। এতে মুখ পরিষ্কার হয়। অযূ গোসলের মাধ্যমে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করতে হয়- এর ফলে শারীরিক পরিচ্ছন্নতা আসে। শারীরিক পরিচ্ছন্নতার সাথে সাথে মনকেও যাবতীয় কুচিন্তা হতে মুক্ত করতে হয়। এতে মানসিক প্রশান্তি আসে। তাছাড়া সালাত আদায় করতে হলে উঠা-বসা করতে হয়। এর মাধ্যমে দৈহিক কসরৎ হয়। এতে দেহ সতেজ সবল হয় এবং দেহ মনে প্রফুল্লতা আসে। সালাতের এতসব কর্মকাণ্ডের কারণে মুসল্লী দৈহিক দিক থেকে ও মানসিক দিক থেকে অনেক রোগ-শোক ও টেনশন থেকে মুক্ত থাকেন। পবিত্র দেহ মন নিয়ে সুন্দর সমাজ গড়ে তোলার প্রেরণায় সদা উজ্জীবিত হন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ৮.২

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

এক কথায় উত্তর দিন-

১. ইসলামী জীবন ব্যবস্থা কয়টি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত?
২. ঈমানের পর ইসলামের প্রধান স্তম্ভ কোনটি?
৩. নামায কি শব্দ? আরবিতে নামাযকে কি বলে?
৪. মহানবী (স) সালাতকে মুমিনের কিসের সাথে তুলনা করেছেন?
৫. যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত নামায ছেড়ে দেয় তাকে কি বলে?
৬. কোন ইবাদাত পাপ ও অশ্লীলতা থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে?
৭. ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারের নামায কায়েমের কোন দায়িত্ব আছে কী?
৮. শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্য নামায কোন উপকারে আসে কি?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. সালাতের পরিচয় দিন।
২. সালাতের ধর্মীয় গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।
৩. সালাতের সামাজিক গুরুত্ব লিখুন।
৪. কল্যাণকর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সালাতের শিক্ষা উল্লেখ করুন।

পাঠ ৩ যাকাতের গুরুত্ব ও শিক্ষা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- যাকাতের পরিচয় তুলে ধরতে পারবেন;
- যাকাতের ধর্মীয় গুরুত্ব বলতে পারবেন;
- যাকাতের আর্থ-সামাজিক শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবেন।

৩.১ যাকাতের পরিচয়

যাকাত ইসলামের তৃতীয় রুকন বা স্তম্ভ। ঈমান ও নামাযের পরই এর স্থান। প্রত্যেক ধনবান মুসলমান নর-নারীদের ওপর যাকাত ফরয। কেউ এর ফরযিয়াতকে অস্বীকার করলে কাফির হয়ে যাবে। যাকাত হল অর্থনৈতিক ইবাদাত। মহানবী (স) যাকাতকে 'ইসলামের সেতু' বলেছেন। যাকাতের ধর্মীয় এবং আর্থ-সামাজিক গুরুত্ব ব্যাপক ও সুবিস্তৃত।

যাকাত (যাকাত) আরবি শব্দ। শব্দটির কয়েকটি অর্থ দেখা যায়। যেমন- পূতপবিত্রতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং প্রবৃদ্ধি-ক্রমবৃদ্ধি। যাকাতের সংজ্ঞা হলো- কোন 'সাহিবে নিসাব' মুসলমানের তথা নিজ ও নিজ পরিবার-পরিজনের জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় বাৎসরিক ব্যয় মেটানোর পর বছর শেষে যদি সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য অথবা তার সমপরিমাণ অর্থ-সম্পদ থাকে, তবে উক্ত ধন সম্পদের শতকরা আড়াই (২.৫%) ভাগ আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত আটটি খাতে প্রদান করাকে যাকাত বলা হয়।

প্রত্যেক 'সাহিবে নিসাব' বা নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদের অধিকারী মুসলিমের ওপর যাকাত প্রদান করা ফরয। অনেক কিছুর ওপরই যাকাত ফরয হয় এবং তা দিতে হয়। জমাকৃত স্বর্ণ, রৌপ্য, জমির ফসল, ব্যবসায়ের পণ্য, গৃহপালিত গবাদি পশু, গরু, ছাগল, উট, মহিষ, ভেড়া, দুম্বা ইত্যাদি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে পৌঁছলে যাকাত দিতে হয়।

৩.২ যাকাতের ধর্মীয় গুরুত্ব

যাকাতের ধর্মীয় গুরুত্বের কিছু দিক নিম্নরূপ :

১. ফরয ইবাদাত : যাকাত একটি আবশ্যকীয় বা ফরয ইবাদাত। যার ওপর যাকাত ফরয হয়েছে, তাকে অবশ্যই যাকাত আদায় করতে হবে। কুরআনে বহুস্থানে সমান গুরুত্ব দিয়ে নামাযের সাথে সাথে যাকাতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যাকাত অস্বীকারকারী কাফির। এ মর্মে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন- "যারা যাকাত আদায় করে না, তারা আখিরাতে অস্বীকারকারী।" (সূরা হামিম-আস-সিজ্‌দা : ৬-৭)

২. ঈমানের পরীক্ষা : যাকাত ফরয করে আল্লাহ তাঁর মুমিন বান্দাকে এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করেছেন যে, সে ধন-সম্পদের মোহ ত্যাগ করে আল্লাহর পথে স্বেচ্ছায় সম্পদের নির্দিষ্ট অংশ ব্যয় করে কিনা। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন- "নিশ্চয় তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ।"

৩. জাহান্নাম হতে মুক্তি : যাকাত আদায়কারী জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। অপরপক্ষে যাকাত আদায় না করলে মহাপাপী হবে এবং জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করতে হবে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন- "যারা স্বর্ণ-রৌপ্য জমা করে, অথচ আল্লাহর রাস্তায় তা খরচ করে না, (হে নবী!) আপনি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সংবাদ প্রদান করুন।" (সূরা তাওবা : ৩৪)

৪. আধ্যাত্মিক শান্তি : একজন মুসলিম স্বেচ্ছায় যাকাত প্রদান করে তার ধন-সম্পদের জন্য আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকে। সে স্বীকার করে ধন-সম্পদ আল্লাহর দান এবং তিনি ইচ্ছা করলে তা কেড়েও নিতে পারেন। তাই আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী যাকাত আদায় করে সে আধ্যাত্মিক শান্তি লাভ করে। যাকাতদাতার মনে আল্লাহর ভয় ও ভালবাসা জন্মায়। তাই যাকাতদাতা সম্পদের সঠিক হিসাব করে নির্ধারিত খাতে ব্যয় করে। এক্ষেত্রে কোনরূপ ফাঁকির প্রবণতা সৃষ্টি হয় না।

৩.৩ যাকাতের সামাজিক শিক্ষা

যাকাতের সামাজিক শিক্ষা ব্যাপক। যাকাতের সামাজিক শিক্ষার কিছু দিক এখানে তুলে ধরা হল :

১. বৈষম্য দূর : যাকাতের মাধ্যমে সমাজে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যকার বিরাজমান বৈষম্য ক্রমে হ্রাস পায় এবং তাদের মধ্যে আর্থ-সামাজিক সমতা সৃষ্টি হওয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

২. দারিদ্র্য বিমোচন : 'সাহিবে নিসাব' ধনী ব্যক্তিগণ যদি সততার সাথে এবং আল্লাহর নির্দেশমত যাকাত আদায় করে, তাহলে সমাজে কোন মানুষ অন্নহীন-বস্ত্রহীন এবং গৃহহীন থাকতে পারে না। দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাতের ভূমিকা সীমাহীন।

৩. সেতুবন্ধ : যাকাত আদায়ের মাধ্যমেই সমাজে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ, সহৃদয়তা ও সহনশীলতার উন্মেষ ঘটে। কেননা, যাকাত হচ্ছে সমাজে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগরণের একটি সুন্দরতম সেতুবন্ধ। মহানবী (স) বলেছেন اَلزَّكَاةُ قَنْطَرَةُ الْاِسْلَامُ "যাকাত হলো ইসলামের সেতুবন্ধন।"

৪. সহানুভূতি সৃষ্টি : যাকাত প্রদানের মাধ্যমে যাকাতদাতা সমাজে অর্থনৈতিকভাবে যারা পিছিয়ে আছে তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে। ফলে সমাজে ধনী-দরিদ্রের ভেদাভেদ কমে আসে। গরিবরাও ধনীদেরকে তাদের বন্ধু ভাবে এবং সহানভূতিশীল হয়ে ওঠে। ধনিক সম্প্রদায়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যাকাত ও দানের অর্থে সমাজের অভাবগ্রস্তদের প্রয়োজন মিটিয়ে বহু সমাজকল্যাণকর ও জনহিতকর কার্যাবলী সম্পাদন করতে পারে। ফলে সমাজ সমৃদ্ধ হয়।

৩.৪ যাকাতের অর্থনৈতিক শিক্ষা

যাকাতের অর্থনৈতিক শিক্ষার কয়েকটি দিক হলো :

১. জাতীয় আয় : যাকাত ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের একটি উৎস। 'সাহিবে নিসাব' ধনী ব্যক্তিরা তাদের সম্পদের শতকরা আড়াই ভাগ জাতীয় যাকাত তহবিলে প্রদান করে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত করতে পারে। ধনী-দরিদ্রের মধ্যে অর্থনৈতিক যে ব্যবধান, তা যাকাতের মাধ্যমে দূর হতে পারে। যাকাতের মাধ্যমে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করা যায়।

২. অর্থনৈতিক নিরাপত্তা : যাকাত মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান করে। অক্ষম ও অসমর্থ সকলকেই যাকাতের অর্থ দিয়ে পুনর্বাসন করতে হয়। এতে যাকাত সর্বজনীন অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা হয়। যাকাত প্রদানের খাতগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে সর্বজনীন অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য এটা কত গুরুত্বপূর্ণ। যাকাতের ৮টি খাত হচ্ছে-

ক. গরিবদের সাহায্য ও জীবিকার বন্দোবস্ত।
খ. অভাবগ্রস্তদের সাহায্য ও জীবিকার বন্দোবস্ত।
গ. যাকাত আদায়ের প্রশাসনিক ব্যয়।
ঘ. দাসমুক্ত করা।
ঙ. ঋণগ্রস্তদের সাহায্য।
চ. নও-মুসলিমদের সাহায্য ও পুনর্বাসন।
ছ. পরিব্রাজকদের সাহায্য।
জ. আল্লাহর পথে কল্যাণকর সামাজিক কার্যে ও যুদ্ধ-জিহাদে।

কুরআনে নির্দেশিত উপরিউক্ত আটটি খাতকে সম্প্রসারিত করে যাকাতের অর্থ আরো ব্যাপকায়তনে অর্থনৈতিক প্রয়োজনে লাগানো যায়। সুতরাং যাকাতের ভূমিকা অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে খুবই বিস্তৃত।

৩. কর্মসংস্থান সৃষ্টি : যাকাত অভাবগ্রস্ত দরিদ্র-দুস্থ মানুষের অভাব-অনটন বিমোচনে এবং জীবন-জীবিকা যোগানদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যাকাত রাষ্ট্রে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করে, যাকাতের অর্থের মাধ্যমে দরিদ্রের কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ও ভারী শিল্প ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে দরিদ্র-বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায়। যাকাতের অর্থ দিয়ে গড়ে ওঠা এ ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠানে গরিব-অভাবী ব্যক্তিরা

কাজ করে অর্থোপার্জন করতে পারে এবং তাদের পরিবারের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও অন্যান্য অর্থনৈতিক অভাব পূরণ করতে পারে। তাছাড়া যাকাতলব্ধ অর্থ দ্বারা ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে ঋণমুক্ত করা যায়।

৪. সম্পদের ক্রমবৃদ্ধি : যাকাত প্রদানের ফলে সম্পদ কোথাও পুঞ্জিভূত হয়ে থাকতে পারে না, অগণিত মানুষের হাতে অর্থ পৌঁছে। ফলে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়ে, বাজারে চাহিদা বাড়লে উৎপাদন বাড়ে, উৎপাদন বাড়লে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। ফলে বেকারত্ব দূর এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও প্রবৃদ্ধি ঘটে। এভাবে যাকাত ইসলামী সমাজে কর্ম, ভোগ, উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করে। যাকাত মজুদদারদের আপোষহীন শত্রু। যাকাত অর্থকে অলসভাবে মজুদ করে রাখার প্রবণতা দূর করে এবং সঞ্চিত সম্পদ বিনিয়োগ করার জন্য বলিষ্ঠ প্রেরণা যোগায়। ফলে অর্থনৈতিক বন্ধাত্ব তিরোহিত হয়ে যায়। যাকাতের উদ্দেশ্য এবং যাকাতের অর্থ ব্যয় করার খাতসমূহ সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত। কাজেই এক্ষেত্রে অপচয়ের সম্ভাবনা নেই। আধুনিক করের মতো যাকাতের ব্যাপারে ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা বিরল। মানুষ ধর্মীয় অনুভূতি নিয়ে স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে যাকাত দিয়ে থাকে। সুতরাং যাকাত হচ্ছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রতি মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্য। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ফাঁকি ও প্রতারণার প্রবণতা দূর করার ক্ষেত্রে যাকাতের ভূমিকা অনন্য।

সারকথা

যাকাত ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার মধ্যমণি। আর্থ-সামাজিক ধর্মীয় ও নৈতিক দিক থেকেও এটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। অতএব, আমাদের উচিত, আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পন্থায় যাকাত দানের মাধ্যমে আমাদের আর্থ-সামাজিক মুক্তি আনায়ন করা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ৮.৩

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন–

১. ইসলামের তৃতীয় রুকন বা স্তম্ভ কি?
   ক. সালাত — খ. নামায
   গ. যাকাত — ঘ. হাজ্জ

২. কাদের উপর যাকাত ফরয?
   ক. সাহিবে নিসাব ব্যক্তিদের — খ. নির্ধন ব্যক্তিদের
   গ. ধনী-গরিব সকলের — ঘ. বড় লোকদের

৩. যাকাত হল–
   ক. শারীরিক ইবাদাত — খ. আর্থিক ইবাদাত
   গ. শারীরিক ও আর্থিক ইবাদাত — ঘ. মানসিক ইবাদাত

৪. যাকাত অর্থ কি?
   ক. পূতপবিত্র — খ. পরিশুদ্ধি
   গ. ক্রম-বৃদ্ধি — ঘ. সব কয়টি ঠিক

৫. শতকরা কত অংশ যাকাত আদায় করতে হয়?
   ক. শতকরা দশভাগ — খ. শতকরা পাঁচ ভাগ
   গ. শতকরা আড়াই ভাগ — ঘ. শতকরা বিশ ভাগ

৬. যাকাতের অর্থ কোথায় খরচ করার বিধান?
   ক. নির্ধারিত আটটি মধ্যে — খ. নির্ধারিত তিনটি খাতে
   গ. গরিব-দুঃখীদের মাঝে — ঘ. সরকারের যাকাত তহবিলে

৭. নিচের কোন বস্তুর যাকাত দিতে হয়?
   ক. জমাকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য — খ. জমির ফসল
   গ. গৃহপালিত গবাদি পশু — ঘ. উপরের সব

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. যাকাতের পরিচয় তুলে ধরুন।
২. যাকাতের ধর্মীয় গুরুত্ব লিখুন।
৩. যাকাতের সামাজিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

৪. যাকাতের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন।

যাকাতের নিসাব, ব্যয়ের খাত, যাকাত ফরয হওয়ার শর্ত ও সাদাকা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- যাকাতের নিসাব কী তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহের বর্ণনা দিতে পারবেন;
- যাকাত ফরয হওয়ার শর্তাবলী জানতে পারবেন;
- যাকাত ও সাদাকা গ্রহণকারীদের পরিচয় তুলে ধরতে পারবেন।

৪.১ যাকাতের নিসাব

সারা বছর যার কাছে নিজের ও পরিবারের যাবতীয় খরচ বাদে সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য থাকে অথবা এর সমপরিমাণ টাকা থাকে এরূপ প্রত্যেক মুসলমানদের ওপর যাকাত ফরয বা বাধ্যতামূলক। ধনীর সম্পদের ওপরে বছরে শতকরা আড়াই ভাগ যাকাতের হার নির্ধারিত হয়েছে। মজুদকৃত অর্থ নিসাব পরিমাণ না হলে যাকাত দিতে হয় না। কেবল নগদ টাকার ওপরই যাকাত ফরয নয়, মুসলমানদের অনেক সম্পদের ওপরই যাকাত ফরয। খেতের ফসল, গরু-মহিষ, ছাগল, ভেড়া, উট, দুম্বা এবং সোনা, রুপা প্রভৃতি মূল্যবান ধাতু ও ব্যবসায়িক পণ্যদ্রব্যেরও যাকাত দিতে হয়। যে সমস্ত জিনিসের যাকাত দিতে হবে, সে সমস্ত জিনিসের মূল্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি থাকতে হবে। কারও সঞ্চয়ের পরিমাণ রূপার ক্ষেত্রে সাড়ে বায়ান্ন তোলা ও সোনার ক্ষেত্রে সাড়ে সাত তোলা পরিমাণ হলে অথবা অনুরূপ অর্থ থাকলে যাকাত দিতে হয়। সকল প্রকার পণ্যের বেলায় রূপার মান হিসেবে মূল্য নির্ধারণ করে নিসাব বা পরিমাণ হিসাব ঠিক করা হয়।

৪.২ যাকাতের অর্থ ব্যয়ের খাত

যাকাত শুধু মুসলমানদের জন্য ফরযই নয় বরং তা আদায় করা তার রাষ্ট্রীয় কর্তব্য। ইসলামে যাকাত রাষ্ট্রীয় আয়ের প্রধান উৎস হিসেবে গণ্য। যাকাত আদায় ও বণ্টনের জন্য রাষ্ট্রীয় বিভাগ ছিল। কোন লোক ব্যক্তিগতভাবে এটি আদায় ও ব্যয় করলে এর পুরোপুরি হক আদায় হয় না। আল-কুরআনের নির্দেশ মোতাবেক এটি আদায় ও খরচ করতে হবে। আল-কুরআনে বলা হয়েছে :

إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۭ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

"যাকাত কেবল মিসকীন ও অভাবগ্রস্তদের জন্য এবং যাকাত সংগ্রহে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারীদের এবং যাদের অন্তরকে (আল্লাহর দিকে) আকৃষ্ট করা প্রয়োজন তাদের জন্য এবং বন্দিদের মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য এবং মুসাফির (প্রবাসীদের) জন্য।" (সূরা তাওবা : ৬০)

কুরআনে উল্লিখিত এ আটটি খাতেই যাকাতের অর্থ ব্যয় করতে হবে। যথা–

(১) ফকির অর্থাৎ যারা একেবারে নিঃস্ব নয়; কিন্তু যাদের মালের পরিমাণ নিসাবের কম, তাদের এ শ্রেণীতে গণ্য করা হয়।
(২) মিসকীন বা বিত্তহীন লোক যার কিছুই নেই। মিসকীন শব্দের অর্থ অচল বা অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি, অন্ধ ও বিকলাঙ্গ ব্যক্তিরা এ পর্যায়ভুক্ত।
(৩) যাকাত সংগ্রহকারী কর্মচারীবৃন্দ। এ সকল কর্মচারীর জন্য যাকাত তহবিল থেকে ব্যয় করা চলে।
(৪) সত্যের সন্ধানী ব্যক্তিগণ। যে সমস্ত ব্যক্তি ইসলামের প্রতি অনুরাগী, কিন্তু অর্থের অভাবে সেই সত্যতা প্রকাশ করতে সক্ষম নয়, তাদের যাকাত তহবিল থেকে সাহায্য প্রদান করা যায়। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার ফলে যারা নিজস্ব বিষয়-সম্পত্তি হারিয়েছে তাদেরও যাকাত তহবিল থেকে সাহায্য প্রদান করা যেতে পারে।
(৫) বন্দিদের মুক্তিদানের ব্যাপারে তাদের মালিকদের যাকাত তহবিল থেকে অর্থ প্রদান করা যায়।
(৬) ঋণ পরিশোধে অসমর্থ লোক। সমাজে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গকে ঋণমুক্ত করার জন্য এক-অষ্টমাংশ ব্যয় করা যেতে পারে। কিন্তু এ অর্থ এমনভাবে প্রদান করতে হবে যাতে অলসতার প্রশ্রয় দেওয়া না হয়।

(৭) বিপদগ্রস্ত ও গন্তব্যস্থলে পৌঁছবার জন্য সাহায্যের মুখাপেক্ষী প্রবাসী। প্রবাসে অবস্থানকালে অর্থের অভাবের কারণে মুসাফিরগণ বিপন্ন হয়ে পড়লে তাদের যাকাত তহবিল থেকে সাহায্য করা যায়।
(৮) ইসলামের রক্ষা ব্যবস্থা। অর্থাৎ ফি-সাবিলিল্লাহি বা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা যেতে পারে। জিহাদে যোগদানকারীকেও যাকাতের অর্থ প্রদান করা যায়।

৪.৩ যাকাত ফরয হওয়ার শর্ত

নিম্নলিখিত শর্তে একজন মুসলমানের প্রতি যাকাত ফরয। যেমন–
(ক) যাকাতদাতাকে মুসলমান হতে হবে;
(খ) যাকাত প্রদানকারীকে বুদ্ধিমান হতে হবে;
(গ) যাকাত প্রদানকারীকে স্বাধীন হতে হবে। পরাধীন ব্যক্তির ওপর যাকাত ফরয নয়;
(ঘ) যাকাত প্রদানকারীকে বালেগ হতে হবে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির ওপর যাকাত ফরয নয়;
(ঙ) নিসাবের মালিক হতে হবে। নিসাবের কম হলে যাকাত ফরয নয়;
(চ) ঋণমুক্ত হতে হবে। ঋণের দায়ে আবদ্ধ ব্যক্তির ওপর যাকাত দেওয়া ফরয নয়;
(ছ) নিসাবের মালিক থাকা অবস্থায় সম্পদ পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হতে হবে; পাগল, অমুসলমানের ওপর যাকাত ফরয নয়।

৪.৪ সাদাকা

ইসলামে দান দু প্রকার- বাধ্যতামূলক ও স্বেচ্ছামূলক। বাধ্যতামূলক দান হচ্ছে যাকাত। স্বেচ্ছামূলক দানকে বলা হয় সাদাকা। সাদাকার জন্য কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। যে কোন মুসলিম যে কোন সময়ে এ ধরনের দান করতে পারে। সাদাকাহ বাধ্যাতমূলক না হলেও এটি খুবই প্রশংসনীয় কাজ। আল-কুরআনে সাদাকার সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়েছে। সাদাকার কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ নেই। মানুষ তার সামর্থ্যানুযায়ী যত ইচ্ছা সাদাকাহ দিতে পারে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে আল্লাহর জন্য ইচ্ছামত দান করা ভাল। নিম্নলিখিত ব্যক্তিকে সাদাকা গ্রহণকারী হিসেবে অনুমোদন করা হয় :

১. নিকট আত্মীয়-স্বজন; ২. ইয়াতীম; ৩. অভাবগ্রস্ত;
৪. প্রবাসী (মুসাফির); ৫. ভিক্ষুক; ৬. বন্দির মুক্তিপণ ক্রয়ের জন্য;
৭. আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে গিয়ে জীবিকা উপার্জনে অক্ষম এমন গরিব লোক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৮.৪

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

এক কথায় উত্তর দিন–

১. সোনা ও রুপার নিসাব কি পরিমাণ?
২. যাকাত শুধু কি নগদ টাকার ওপরই ফরয?
৩. যাকাত কি রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস?
৪. যাকাত আদায়ে সরকারের কোন দায়িত্ব আছে কী?
৫. মিসকীন মানে কী?
৬. ফকির কাকে বলে?
৭. অপ্রাপ্ত বয়স্ক লোকের উপর কি যাকাত বাধ্যতামূলক?
৮. নিসাব পরিমাণ সম্পদ কী এক বছর হাতে থাকতে হবে?
৯. ইসলামে দান কত প্রকার?
১০. স্বেচ্ছামূলক দানকে কী বলা হয়?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. যাকাতের নিসাব কাকে বলে?
২. যাকাতের অর্থ ব্যয়ের খাতসমূহ উল্লেখ করুন।
৩. যাকাত ব্যয়ের নির্ধারিত আটটি খাত উল্লেখ করে যে আয়াতটি রয়েছে- তা মুখস্থ বলুন।
৪. যাকাত ফরয হওয়ার শর্তসমূহ লিখুন।
৫. সাদাকা কী? সাদাকার অর্থ গ্রহণকারী ব্যক্তিদের তালিকা উল্লেখ করুন।

পাঠ ৫ সাওমের গুরুত্ব ও শিক্ষা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- সাওমের পরিচয় বলতে পারবেন;
- সাওমের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;
- সাওমের সামাজিক শিক্ষা বলতে পারবেন।

৫.১ সাওমের পরিচয়

ইসলামে যাকাতের পরেই সাওমের স্থান। সাওম ইসলামের পাঁচটি বুনিয়াদের মধ্যে তৃতীয়। প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্ত ও সুস্থ মুসলমানের ওপর রমযান মাসে সাওম পালন করা 'ফরয' (বাধ্যতামূলক)। সাওম মানে বর্জন করা বা বিরত থাকা। ইসলামী শরীআতের পরিভাষায় সুবহে সাদিকের পূর্ব থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিয়াতের সাথে যাবতীয় পানাহার ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি থেকে বিরত থাকার নাম 'সাওম'।

হিজরি দ্বিতীয় বছরে রমযান মাসে ইসলামে সাওম পালন করার বিধান চালু হয়। আল্লাহ তাআলা আল-কুরআনে এ মর্মে ঘোষণা দেন-

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর সাওম (বিধান) ফরয করা হল, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী (নবীদের) উম্মত গণের ওপর। যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।" (সূরা বাকারা : ১৮৩)

এ রমযান মাসেই 'লাইলাতুল কদর' নামক এক মহিমান্বিত রাতে সমগ্র কুরআন মাজীদ 'লাওহে মাহফুয' থেকে বাইতুল ইয্যাত নামক পৃথিবীর নিকটতম আসমানে অবতীর্ণ হয়।

এর পূর্বে মহানবী (স) মহররম মাসের দশ তারিখে সাওম পালন করতেন। এ সময়ে রাসূলে করীম (স) য়াহূদীদের রীতি অনুযায়ী সাওম পালন করতেন। কিন্তু যখন তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন, তখন তিনি উপবাস প্রথার পরিবর্তে আল্লাহ তাআলার কাছে নিজের জন্য স্বতন্ত্র রীতিনীতির আবেদন জানালেন। তখন ওহী আসল রমযান মাসে সাওম পালন করতে হবে (৬২৩ খ্রি.)।

সাওম একটি প্রাচীন ধর্মীয় অনুশাসন বা অনুষ্ঠান। এটি হযরত মূসা (আ)-এর উম্মতদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। সাওমের প্রচলন প্রায় সকল ঐশী ধর্মের মধ্যে থাকলেও তার ধরন ও উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। য়াহূদীদের মধ্যে সাওম দুঃখ বা শোকের চিহ্ন হিসাবে পালন করা হত। হযরত দাউদ (আ) তাঁর শিশুপুত্রের অসুস্থতার সময় সাত দিন সাওম পালন করেছিলেন। হযরত মূসা (আ) চল্লিশ দিন এবং মহররমের দশ তারিখে সাওম পালন করতেন। হযরত মূসা (আ)-এর অনুকরণে হযরত ঈসা (আ) নিজে চল্লিশ দিন সাওম পালন করতেন। তিনি তাঁর অনুসারীদেরও সাওম পালন করতে নির্দেশ দিতেন। আরবের ইসলাম পূর্ব যুগের লোকেরাও সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি অথবা কোন দুঃখজনক ঘটনার স্মরণার্থে সাওম পালন করত। কিন্তু ইসলামে এ ধরনের সাওম পালনের বিধান নেই। এটি পরিপূর্ণ ও নতুন রূপ লাভ করেছে। ধর্মানুষ্ঠান হিসেবে সাওম আধ্যাত্মিক ও দৈহিক শৃঙ্খলার উচ্চতম বিন্যাস। এটি মানুষকে আধ্যাত্মিক পূর্ণতায় পৌঁছাতে সাহায্য করে।

রমযান মাসকে সিয়াম সাধনার জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে। 'রময' শব্দের অর্থ-পুড়িয়ে ফেলা বা জ্বালিয়ে দেয়া। মানুষের যাবতীয় খারাপ প্রবণতাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়ার জন্য বছর ঘুরে আসে রমযান মাস। এ মাসে আল-কুরআন নাযিল হয়েছে। এ জন্য রমযান মাসকে সিয়াম সাধনার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। রমযান মাস ইবাদাতের মাস। মানুষ এ মাসে বেশি বেশি ইবাদাত করে।

৫.২ সাওমের ধর্মীয় গুরুত্ব ও শিক্ষা

আত্মিক উৎকর্ষ সাধন : আত্মিক উৎকর্ষ সাধনে রোযা একটি অপরিহার্য বা সকল যুগ ও কালের ইবাদাত। রোযা কেবল মুসলমানদের জন্যই অপরিহার্য নয় এবং পূর্ববর্তী কালের সকল নবী-রাসূলের উম্মাতের উপর অপরিহার্য

ছিল। এ মর্মে কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে "রোযা তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে যেমন করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর।" (সূরা বাকারা : ১৮৩)

তাকওয়া সৃষ্টি : রোযার মাধ্যমে মানব হৃদয়ে তাকওয়া বা আল্লাহর প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হয়। ক্ষুধা, তৃষ্ণায় কাতর হয়েও মহান প্রভুর ভালবাসা ও ভয়ে বান্দার কিছুই গ্রহণ না করা এবং যাবতীয় অন্যায়-অনাচার থেকে বিরত থাকা 'তাকওয়ার' নিদর্শন। মহান আল্লাহ বলেন- "তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে যেন তোমরা তাকওয়ার গুণ অর্জন করতে পার।" রোযার মধ্যে কোনরূপ বাহ্যিকতা বা লৌকিকতা নেই। রোযা একমাত্র আল্লাহর প্রেম ও ভালবাসারই নিদর্শন। রোযা মানুষের চরিত্র গঠনে সাহায্য করে। রোযা রাখলে মানব মনে খোদা-ভীতি জাগ্রত হয়, সংযমে ও আত্মশুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ করে এবং মানুষকে কঠোর সাধনায় অভ্যস্ত করে। এটা একটি নীরব ইবাদাত।

রোযা ঢাল স্বরূপ : রোযা মানুষকে ষড়রিপুর আক্রমণ থেকে ঢাল স্বরূপ বাঁচিয়ে রাখে। কাম, ক্রোধ, লোভ-লালসা ইত্যাদি রিপুর তাড়নায় মানুষ বিপদগামী হয়ে ধ্বংসের মুখোমুখি হয়; রোযা মানুষের এসকল কুপ্রবৃত্তি দমন করে। এ কারণেই মহানবী (স) বলেছেন : اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ "রোযা ঢাল স্বরূপ"।

রোযা মুক্তির উপায় : কিয়ামতের কঠিন মুহূর্তে রোযা বান্দার মুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে। এ মর্মে মহানবী (স) বলেন : "রোযাসমূহ সুপারিশ করে বলবে, হে প্রভু! আমি এ ব্যক্তিকে দিনে পানাহার ও অন্যান্য কামনা বাসনা হতে ফিরিয়ে রেখেছি। আপনি আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। আল্লাহ সুপারিশ গ্রহণ করবেন।" (বাইহাকী) করুণাময় মহান প্রভু রোযাদার বান্দার পূর্বকৃত সকল গুনাহ ও অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন। এ মর্মে মহানবী (স) বলেন : "যে ব্যক্তি ঈমান ও আন্তরিশ্লেষণের সাথে রোযা পালন করল; সে পূর্বকৃত গুনাহ মার্জনা করে নিল।" মহানবী (স) আরো বলেন : "যারা রমযান মাসের প্রথম হতে শেষ নাগাদ রোযা পালন করেছে, তারা সদ্যোজাত শিশুর মত নিষ্পাপ হয়ে যাবে।"

সাওমের ফযীলতও অত্যধিক। আল্লাহ স্বয়ং নিজ হাতে এর প্রতিদান দেবেন। হাদীসে কুদসীতে এসেছে-

اَلصَّوْمُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهٖ

"সাওম একমাত্র আমার জন্যই। আর আমি নিজেই এর প্রতিদান দেব।"

সাওমের সওয়াব দশ থেকে সত্তর গুণ পর্যন্ত আল্লাহ দান করে থাকেন। রমযানের শেষের দশ দিন আরও তাৎপর্যপূর্ণ এ জন্য যে, এ সময়ে ইতিকাফ বা মসজিদে অবস্থান করা হয়। ইতিকাফে অত্যন্ত সওয়াব আছে। এভাবে রমযানের পুরো মাসটিই ফযীলতপূর্ণ। রমযানের সাওম পালনের পর আসে ঈদুল ফিতর। ঈদুল ফিতর মুসলমানদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় পর্ব। এ দিনে মুসলমানরা ঈদগাহে জামাআতে ঈদুল ফিতরের সালাত আদায় করেন। সালাতের পূর্বে প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলমানকে নির্দিষ্ট পরিমাণ ফিতরা আদায় করতে হয়। কঠিন ভয়াবহ হাশরের ময়দানে যে দিন আল্লাহর আরশের ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না- যেদিন সবাই স্বীয় কৃতকর্মের হিসেব-নিকেশ দেয়ার জন্য উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ছুটাছুটি করবে- সেই বিভীষিকাময় দিনে রোযাদারগণ "আল্লাহর আরশের" নিচে স্থান লাভ করবে।

ফরয সাওম ব্যতীত নফল সাওমও আছে। বছরে পাঁচ দিন ব্যতীত অন্য যে কোন দিন তা পালন করা যায়।

৫.৩ সাওমের সামাজিক শিক্ষা

সহানুভূতি ও সহমর্মিতা সৃষ্টি : সাওমের অনুশীলনের মাধ্যমে সামাজিক জীবনে মানুষ ক্ষুধার্ত, অনাহারী ও অর্ধাহারী মানুষের দুঃখ-কষ্ট এবং ক্ষুধা-পিপাসার অসহ্য কষ্ট উপলব্ধি করতে পারে। ক্ষুধা-পিপাসার যন্ত্রণা যে কিরূপ কষ্টকর, তা বুঝতে পেরে অভাবী ও নিরন্নের প্রতি সহানুভীতি ও সহমর্মিতার ভাব জাগ্রত হতে পারে। যার ফলে সমাজের মানুষ পারস্পরিক বিভেদ-বৈষম্য ভুলে একই শ্রেণীভুক্ত হয়ে থাকে।

আদর্শ সমাজ গঠন : সাওম পালনের মাধ্যমে মানুষ ষড়রিপুর তাড়না থেকে রক্ষা পায়। যার ফলে লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা, ক্রোধ, হিংসা-বিদ্বেষ, মিথ্যা প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, পরনিন্দা, ঝগড়া-ফাসাদ, অশ্লীলতার চর্চা প্রভৃতি থেকে মুক্ত হয়ে সুষ্ঠু-সুন্দর আদর্শ জীবন লাভ করে থাকে। আর এসব আদর্শ গুণাবলি মানুষের ব্যক্তিগত চরিত্র

উন্নত করে। সমাজের প্রতি স্বীয় চরিত্রের প্রভাব প্রতিফলিত হয়ে সুন্দর ও আদর্শ সমাজ গড়ে তোলে। এ কারণে সমাজ গঠনে সাওমের গুরুত্ব অত্যধিক।

বছরে দীর্ঘ একমাস সাওম পালনের অনুশীলন দ্বারা ব্যক্তিকে তথা সমাজের প্রত্যেকটি মানুষকে সমগ্র জীবনের জন্য চরিত্রবান ও আদর্শবান করে গড়ে তোলে। এতে সমাজ থেকে পাপাচার, অন্যায়, অপরাধ প্রভৃতি নিন্দনীয় কাজসমূহ দূরীভূত হয়ে স্থায়ী ও সুখী-সুন্দর, পূতপবিত্র আদর্শ সমাজ গঠিত হয়।

সাম্য প্রতিষ্ঠা : পৃথিবীর সকল মানুষ যে মহান আল্লাহর সৃষ্টি এবং প্রতিটি মানুষের যে সমান অধিকার রয়েছে সাওমের মাধ্যমে তার বাস্তবতা অনুভূত হয়ে থাকে। একমাত্র সাওমের মাধ্যমেই ধনী-দরিদ্র সকল মানুষ এক কাতারে চলে আসে।

সদ্ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করে : সাওম সমাজের অবহেলিত ও মেহনতি মানুষের সাথে সদ্ব্যবহারের শিক্ষা দেয়। এ প্রসঙ্গে নবী করীম (স)-বলেন, "এ মাসে যারা দাস-দাসীদের প্রতি সদয় ব্যবহার করে তথা তাদের কাজের বোঝা হালকা করে দেয়, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দেন এবং দোযখের আগুন হতে রক্ষা করেন।"

ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করে : প্রত্যেক মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই। সাওম সকলের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। কারণ সাওমের মাধ্যমে মানুষ মহান আল্লাহর আদেশ একই নিয়মে পালন করে থাকে। সমাজের প্রতিটি মানুষকে একই সূত্রে গ্রথিত করে এবং অন্যের সুখে-দুঃখে এগিয়ে আসার অনুভূতি পয়দা করে। সকলের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ এবং পরস্পরে সম্প্রীতি সৃষ্টি করে।

চেতনা জাগ্রত হয় : মুসলিম উম্মাহর ঐতিহ্য চেতনায় এবং ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে রমযানের সাওম পালন অতি উত্তম ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ পবিত্র মাসেই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মানব জাতির উদ্দেশ্যে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন প্রথম নাযিল হয় এবং ইসলামী জীবন ব্যবস্থার বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ মাসেই এক দিকে অন্ধকার যুগের অপসারণ, অন্যায়-অত্যাচার ও যুলুম-অধর্মের অবসান ঘোষিত হয় এবং অন্য দিকে একটি নব যুগের আবির্ভাব ন্যায়, সত্য ও শাশ্বত মানব জাতির সুষ্ঠু জীবনবিধান প্রতিষ্ঠার মহা সুসংবাদ মুমিনের সামনে উপস্থিত হয়। সাওমের এ মাসেই মহান রাব্বুল আলামীনের বিধান ও শাসন প্রতিষ্ঠার আহ্বান আসে। এ মাসেই মুসলমানগণ বদরের যুদ্ধে ইসলামের দুশমনদের পরাজিত করেন এবং এ মাসেই মুসলমানগণ মক্কা জয় করে বাইতুল্লাহকে তাওহীদের প্রাণকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করেন। এজন্যই বলা হয়, রমযান মাস ইসলাম প্রতিষ্ঠার মাস। বিজয়ের মাস। মুসলমানদের দ্বীন-দুনিয়ার সমৃদ্ধি, পার্থিব ও আধ্যাত্মিক উন্নতি, দৈহিক ও মানসিক শ্রেষ্ঠত্ব আর তাদের গৌরব ও মর্যাদার অবিস্মরণীয় স্মৃতি বয়ে আসে এ মাসে।

দৈহিক সুস্থতা বিধান : সাওমের মূল উদ্দেশ্য নৈতিক, আধ্যাত্মিক, ঈমানী গুণাবলি সৃষ্টি করে। কিন্তু এসব গুণাবলী অর্জনের পাশাপাশি দৈহিক কল্যাণের দিকটি কোনক্রমেই বাদ দেওয়া যায় না। চিকিৎসা বিজ্ঞানের মাধ্যমে এটি প্রমাণিত হয়েছে, দেহযন্ত্রের পরিপাকযন্ত্রেরও মাঝে মাঝে বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। অব্যাহত ভোগ মানুষের দেহযন্ত্রকে অবসন্ন ও একঘরে করে দেয়। এ জন্য মাঝে মধ্যে উপবাস থাকা স্বাস্থ্যের জন্য মঙ্গলজনক। তাছাড়া দেহকে ক্ষুধা ও পিপাসার কষ্ট সহ্য করার শক্তি ও আত্মবিশ্বাস একজন সংগ্রামী মানুষের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশিক্ষণ : পবিত্র রমযান মাস হচ্ছে মুসলমানদের জন্য প্রক্ষিণের মাস। এ মাসের সাওম পালন হল ব্যক্তি ও সমাজ গঠনের প্রশিক্ষণ। পার্থিব জীবনে যে কোন পেশায় আগ্রহী ব্যক্তিকে সুনির্দিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করতে হয়। প্রশিক্ষণের পর স্ব স্ব পেশায় নিয়োজিত হয়। পেশায় বহালের পর পদোন্নতি বা অভিজ্ঞতা ধরে রাখার জন্য মাঝে মধ্যে কিছু প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে হয়। এসব প্রশিক্ষণলব্ধ অভিজ্ঞতা পেশাগত জীবনে কাজে লাগাতে হয়। ঠিক তেমনি রমযান মাস হচ্ছে বছরের ১২ মাসের মধ্যে এক মাসের প্রশিক্ষণ কোর্স। এটি সমাপ্ত করতে হবে দক্ষতার সাথে। আর এ দক্ষতা বাকি ১১ মাস কাজে লাগাতে হবে। সাওম পালনের মাধ্যমে যে গুণাবলি অর্জিত হবে, তাই হবে আল্লাহর বান্দা হিসেবে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের দক্ষতা। এ দক্ষতার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার প্রতিনিধিত্ব করাই হচ্ছে মানুষের মূল কাজ।

রমযান মাসের সাওম পালন একটি সমষ্টিগত ও আন্তর্জাতিক ইবাদাত। এ মাসটির আগমনের সাথে সাথে সারা দুনিয়ার মুসলমানদের মধ্যে এক অনাবিল প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দেয়। সমবেতভাবে এমন এক আনন্দঘন পরিবেশ

সৃষ্টি হয়ে যায়, যাতে সাওম সাধনা সবার জন্য সহজসাধ্য হয়। মুমিনের মন আপনা থেকেই যেন উৎসাহিত হয়ে ওঠে। এ মাসে প্রতিযোগিতা শুরু হয় ইবাদাত-বন্দেগী, দান-খয়রাত, পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহযোগিতায় কে কার চেয়ে বেশি অগ্রগামী হবে।

মুসলিম উম্মাহ বিভিন্ন শ্রেণী ও বিভিন্ন মতাবলম্বী হয়েও যখন একই সময়ে একটি বিশেষ বিষয়ে ঐকমত্য হয় এবং একে অপরকে প্রত্যক্ষ করে, তখন এটি যত কঠিন বিষয়ই হোক না কেন, তা পালনে কোনরূপ অসুবিধা সৃষ্টি হয় না। তেমনিভাবে সাওমও একই সময়ে সারা বিশ্বব্যাপী পালন করা হয় বলে এটি সবার জন্য সহজসাধ্য হয়ে যায়। আর এর মাধ্যমে ঐক্য ও সৎসাহস বৃদ্ধি পায়। এভাবে সাওম আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।

আর্থ-সামাজিকতার ক্ষেত্রে : সাওমের অর্থনৈতিক গুরুত্বও কম নয়। মানুষে মানুষে ভেদাভেদহীন ও শোষণমুক্ত আর্থ-সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে সাওম বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম। মানুষ দুঃখ-কষ্ট ও ক্ষুধায় নিপতিত না হলে অপরের দুঃখ-কষ্ট ও ক্ষুৎপিপাসার কষ্ট অনুভব করতে পারে না। এ কারণে সমাজে শোষক শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। সাওম পালনের মাধ্যমে ধনীরাও দীর্ঘ এক মাস ক্ষুৎপিপাসার কষ্ট যে কত অসহনীয়, তা অনুভব করতে পারে। আর তাই তারা অভাবমুক্ত, ক্ষুধামুক্ত সমাজ ও পৃথিবী গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। এজন্য তারা দান-খয়রাত, যাকাত-ফিতরা ইত্যাদির মাধ্যমে দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ গড়ে তোলার জন্য এগিয়ে আসে। কাজেই আর্থ-সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণে ও শোষণমুক্ত ও ক্ষুধামুক্ত সমাজ গড়তে সাওমের গুরুত্ব কম নয়।

সুন্দর পরিবেশ গড়ে তোলা : উন্নতি ও বিকাশের জন্য মানুষের উত্তম পরিবেশ প্রয়োজন। পবিত্র ও পুণ্যময় জীবন যাপনের জন্য পবিত্র ও সুন্দর অনুকূল পরিবেশ একান্ত অপরিহার্য। পরিবেশ সুন্দর না হলে, ভাল না হলে মানুষের জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলা যায় না। রমযান মাস মুসলমানদের জন্য এক সুন্দর ও পূতপবিত্র পরিবেশ নিয়ে আসে। পুণ্যময় জীবনযাপনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয় এ মাসে। সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও ভ্রাতৃত্বের পরিবেশ সৃষ্টি করে সাওম। সাওম সাধনার মাধ্যমে মানুষ পুণ্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার পরিবেশ পায়। সেই সাথে পাপ থেকে দূরে থাকার সুযোগ পায়। সর্বত্র যেন এক শান্ত-সৌম্য, পূতপবিত্রতা বিরাজ করে। সকল পরিবেশ যেন পুণ্যের আবেশে আবিষ্ট হয়ে উঠে।

বস্তুত সমাজ উন্নয়নের জন্য, সামাজিক সুষম বিকাশের জন্য, বিশ্বমানবের প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধনকে সুদৃঢ় করার মানসে, পরস্পর সহানুভূতি ও সহমর্মিতা সৃষ্টি এবং সুন্দর পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য সাওম পালন একান্ত অপরিহার্য।

সারকথা

সাওমের বিরাট সামাজিক শিক্ষা রয়েছে। এটি মুসলমানদের মধ্যকার সামাজিক ও ধর্মীয় বন্ধনকে সুদৃঢ় করে। সালাতে আমীর-ফকির, বাদশাহ ও দীনতম ভিক্ষুক পরিপূর্ণ সাম্যের মনোভাব নিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এক সারিতে দাঁড়ায়; কিন্তু নিজ নিজ গৃহে তারা স্বতন্ত্র পারিপার্শ্বিকতার যতনকারী। ধনী সেখানে উত্তম ও উপাদেয় খাদ্য দ্বারা উদর পূর্তি করে, দরিদ্রকে সেখানে ক্ষুধা নিবৃত্তির উপযোগী খাদ্যের অভাবে অনাহারে, অনশনে দিন কাটাতে হয়। গরিব যখন ক্ষুধার তীব্র পীড়নে জর্জরিত হয়, তখন ধনী ব্যক্তির মনে সে বেদনার অনুভূতি জাগ্রত হওয়ার অবকাশ পায় না। কিন্তু রমযান আসার সঙ্গে সঙ্গে সকল সামাজিক বৈষম্য দূরীভূত হয়। এই একটি মাস ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকল মুসলমানকে সমভাবে পানাহারে বিরত থাকতে হয়। যে ধনী ব্যক্তির ঘরে খাদ্য বস্তুর প্রাচুর্য রয়েছে, তাকেও দু এক দিন নয়, পুরো এক মাস দিনের বেলা অনাহারে কাটাতে হয়। সুতরাং মুসলিম জাহানে ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে সকল মানুষকে এ সময়ে একই পর্যায়ে এনে দেয়। রমযান মাসের ক্ষুধার অনুভূতি ধনীর অন্তরে দরিদ্রের জন্য সহানুভূতি জাগিয়ে দেয়। এ কারণেই রমযান মাসে বিশেষভাবে দরিদ্রকে সাহায্য করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ৮.৫

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

এক কথায় উত্তর দিন–

১. ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ কি?
২. কার উপর সাওম বাধ্যতামূলক?
৩. কখন সাওম-এর বিধান চালু হয়?
৪. রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পূর্বে মহানবী (স) কখন রোযা রাখতেন?
৫. কোন ইবাদত প্রাচীন অনুশাসন?
৬. তাকওয়া সৃষ্টিতে রোযার মূল্যায়ন করুন।
৭. 'রোযা ঢালস্বরূপ'- কার বাণী? হাদীসটি আরবিতে বলুন।
৮. হাশরের ময়দানে রোযাদারগণ কোথায় স্থান লাভ করবে?
৯. রোযার পুরস্কার কী?
১০. রোযার প্রতিদান ঘোষণার হাদীসটি মুখস্থ লিখুন।
১১. ইতিকাফ কী?
১২. ফিতরা কি?
১৩. কখন ফিতরা দিতে হয়?
১৪. মুসলমানদের প্রশিক্ষণের মাস কোনটি?
১৫. সর্বজনীন ও সমষ্টিগত আন্তর্জাতিক ইবাদাত কোনটি?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. সাওমের পরিচয় তুলে ধরুন।
২. "সাওম একটি প্রাচীন অনুশাসন বা ধর্মানুষ্ঠানের নাম" বিশ্লেষণ করুন।
৩. সাওমের ধর্মীয় গুরুত্বের কতিপয় দিক তুলে ধরুন।
৪. সাওমের সামাজিক শিক্ষা কি কি? তার একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।
৫. ব্যক্তি ও সমাজ গঠনে সাওমের ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ৬ হাজ্জের গুরুত্ব ও শিক্ষা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- হাজ্জের পরিচয় বলতে পারবেন;
- হাজ্জের ধর্মীয় গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;
- হাজ্জের সামাজিক শিক্ষা বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- হাজ্জের অর্থনৈতিক শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবেন।

৬.১ হাজ্জের পরিচয় ও পটভূমি

হাজ্জ একটি অনুষ্ঠানিক ইবাদাত। হাজ্জ ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভের অন্যতম। হাজ্জ-এর শাব্দিক ও আভিধানিক অর্থ- কোন সম্মানিত স্থানে গমনের সংকল্প। ইসলামী পরিভাষায় হাজ্জ-এর অর্থ মক্কা মুআযযামায় অবস্থিত কাবা শরীফের পার্শ্ববর্তী কয়েকটি স্থানে কতিপয় বিশেষ অনুষ্ঠান পালনের সংকল্প। নির্দিষ্ট দিনক্ষণে অনুষ্ঠানগুলো সম্পন্ন করাকেও হাজ্জ বলে। নির্দিষ্ট স্থানগুলো হচ্ছে : মক্কা শরীফ ও পার্শ্ববর্তী মিনা, আরাফাত ও মুজদালিফা। হাজ্জের সময় হচ্ছে যিলহাজ্জ মাসের আট তারিখ থেকে বার তারিখ পর্যন্ত।

প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ-বুদ্ধিসম্পন্ন, সমর্থ মুসলিম নর-নারীর জন্য জীবনে অন্তত একবার হাজ্জ করা ফরয। আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

"আল্লাহর জন্য মানুষের ওপর ফরয বাইতুল্লাহর হাজ্জ। যে ব্যক্তি সমর্থ হয়েছে এর (বাইতুল্লাহর দিকে) পথ চলার যার আছে সফরের শারীরিক এবং আর্থিক সামর্থ্য।" (সূরা আলে-ইমরান : ৯৭)

তবে মক্কার মুসলমানের জন্য গরিব হলেও হাজ্জ ফরয। কারণ, তারা মক্কা মুআযযামার এত নিকটে বসবাস করে যে, তারা পায়ে হেঁটে হাজ্জ পালন করতে পারে। এছাড়া মক্কার বাইরের লোক গরিব হলেও হাজ্জের সময়ে মক্কাতে উপস্থিত থাকলে তার জন্য হাজ্জ ফরয বা বাধ্যতামূলক। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে ইসলাম বলে, যে স্ত্রীলোকের স্বামী জীবিত নেই সে এমন একজন সঙ্গীর সাথে মক্কা শরীফে গমন করতে পারবে যার সাথে উক্ত স্ত্রীলোকের বিবাহ হারাম। উপযুক্ত সঙ্গী না থাকলে স্ত্রীলোকের জন্য হাজ্জ ফরয নয়।

হাজ্জের নির্দেশ নতুন কিছু নয়। ইতিহাসে এর প্রবর্তনের কোন নির্দিষ্ট তারিখের উল্লেখ নেই। কুরআন মাজীদের বর্ণনানুসারে হযরত ইবরাহীম (আ) হাজ্জের প্রচলন করেন। আল-কুরআনে উল্লেখ আছে-

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ

"অবশ্যই প্রথম গৃহ, যা মানব জাতির জন্য প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, অবশ্যই তা মক্কায় অবস্থিত। বরকত বা কল্যাণকর রূপে এবং নিখিল বিশ্বের পথের দিশারী রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে ঘর"। (সূরা আলে-ইমরান : ৯৬)

কুরআন মাজীদে এ ঘরকে 'আল-বাইতুল আতীক' বা সুপ্রাচীন পবিত্র গৃহ রূপে আল-কুরআনের নির্দেশানুসারে হযরত ইবরাহীম (আ) হাজ্জের প্রচলন করেন। ইসলাম প্রচারের পূর্বেও এর প্রচলন ছিল, তবে হাজ্জের রীতি-নীতি প্রতিষ্ঠা করেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (স)। জাহিলিয়া যুগে আরবের পৌত্তলিকরা বিবস্ত্র অবস্থায় কাবার তাওয়াফ করত। ইসলাম সুন্দর তাই ইসলামের বিধান ও রীতিনীতিও সুন্দর।

কাবা ঘরই দুনিয়ার বুকে আল্লাহ তা'আলার ইবাদাতের সর্বপ্রথম গৃহ। আল-কুরআনে একে বাইতুল আতীক অর্থাৎ সুপ্রাচীন গৃহ বলা হয়েছে। এই স্থানে সকল প্রকার ঝগড়া-বিবাদ এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ বলে এর অপর নাম 'বাইতুল হারাম'। দুনিয়ার প্রথম মানুষ হযরত আদম (আ)ও এখানে ইবাদাত করতেন।

হাজ্জ প্রবর্তনের সঠিক তারিখ জানা না গেলেও হাজ্জের কতিপয় অনুষ্ঠান যথা- তাওয়াফ, হাজরে আসওয়াদ চুম্বন এবং সাফা মারওয়ায়ে সাঈ ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেও প্রচলিত ছিল। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সময় থেকে হাজ্জ একটি নিয়মিত অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। হাজ্জের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ যা হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সময় প্রচলিত হয় তা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর অনুষ্ঠানের ওপরই প্রতিষ্ঠিত।

হাজ্জের নির্দিষ্ট দিনগুলো ব্যতীত শরীআত নির্ধারিত পন্থায় কাবা শরীফের তাওয়াফ করাকে উমরা বা সংক্ষিপ্ত বা ছোট হাজ্জ বলা হয়। সারা বছরই উমরা করা যায়। হাজ্জের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ হচ্ছে (ক) ইহরাম বাঁধা, (খ) তাওয়াফও (গ) আরাফাতে অবস্থান। এ তিনটি কাজ হাজ্জের মধ্যে ফরয। অন্যান্য অনুষ্ঠানসমূহ যথাক্রমে ওয়াজিব ও সুন্নাত। ওয়াজিব হচ্ছে- (ক) সাফা মারওয়ায় সাঈ; (খ) মুযদালিফায় অবস্থান; (গ) কঙ্কর নিক্ষেপ; (ঘ) বিদায়ী তাওয়াফ (বহিরাগত হাজীদের জন্য) মাথামুণ্ডন করা। যে সব কাজ বাদ পড়লে কুরবানী দিতে হয় তাও ওয়াজিব; বাকি সব সুন্নাত।

৬.২ হাজ্জের ধর্মীয় গুরুত্ব

ইসলামের ইতিহাসে হাজ্জ একটি গুরুত্বপূর্ণ আনুষ্ঠানিক ইবাদাত। প্রতি বছর বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে লক্ষ লক্ষ মুসলমান মক্কায় হাজ্জ অনুষ্ঠান পালন করতে আসেন। হাজ্জের প্রধান শিক্ষা হচ্ছে যে, হাজ্জের কারণে হাজীদের জীবনের পাপরাশি মোচন হয় ও ঈমানকে শক্তিশালী করে। মহানবী (স) এবং ইসলামের অন্যান্য মহান ব্যক্তিদের জীবন ও কার্যাবলি যেখানে স্মৃতিবিজড়িত, সেই মক্কায় যিয়ারত হাজীদের মনের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। যখন তাঁরা মক্কাতে প্রবেশ করেন, তখনই ইসলামের প্রথম যুগের সমগ্র ইতিহাস তাঁদের মানসপটে ভেসে ওঠে। তাঁরা মক্কা নগরীর কাবাগৃহ, সাফা মারওয়া, মিনা, আরাফাত, মুযদালিফা প্রভৃতি স্থানে প্রাথমিক যুগের ইসলামের স্মৃতি দেখতে পান। এতে তাঁরা ইসলামের আদর্শে আবার অনুপ্রাণিত হন।

হাজ্জ ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অন্যতম বুনিয়াদী ইবাদাত। এটি শারীরিক, মানসিক এবং আর্থিক ইবাদাতের অনন্য সমন্বয়। হাজ্জের ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুরুত্ব অপরিসীম। নিচে এ সম্পর্কে আলোচিত হলো :

হাজ্জ একটি সার্বিক ইবাদাত : ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ হাজ্জ একটি সার্বিক ইবাদাত। হাজ্জ একাধারে দৈহিক, আর্থিক ও মানসিক ইবাদাত। এ অনন্য ইবাদাত দ্বারা নিষ্ঠা, তাকওয়া, নম্রতা, আনুগত্য, প্রবৃত্তি কামনা বাসনা শুদ্ধি, ত্যাগ, কুরবানী, আত্মসমর্পণ ও আল্লাহর নৈকট্য ও সান্নিধ্য প্রভৃতির প্রেরণা ও ভাবাবেগ পৃথকভাবে বিকাশ লাভ করে।

মহান আল্লাহ প্রত্যেক সক্ষম ও সামর্থ্যবান মুসলিমের উপর হাজ্জ ফরয করে দিয়ে ঘোষণা করেন–

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

"মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য।"
(সূরা আলে-ইমরান: ৯৭)

আর মুসলিমগণ হাজ্জ করার মাধ্যমে মহান আল্লাহর এ নির্দেশই পালন করে থাকেন।

হাজ্জব্রত পালনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়। তাই বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে একমাত্র বিশ্ব প্রভু আল্লাহর সন্তুষ্টি ও রেজামন্দি হাসিলের প্রবল বাসনায় বিশ্ব মুসলিম আল্লাহর ঘর কাবার পানে ছুটে আসে এবং তাঁর দরবারে হাজিরা দেয়।

যার উপর হাজ্জ ফরয করা হয়েছে সে যদি বিনা কারণে হাজ্জ ব্রত পালন না করে তা হলে ধর্মচ্যুতি হওয়ার আশংকা আছে।

যে ব্যক্তি করুণাময় আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হাজ্জব্রত পালন করে, আল্লাহ তার যাবতীয় পাপ মাফ করে দেন। সে নবজাত শিশুর মত নিষ্পাপ হয়ে যায়। নবী করীম (স) এ মর্মে বলেন : পানি যেমন ময়লা আবর্জনা ধুয়ে পরিচ্ছন্ন করে দেয়, হাজ্জও তদ্রূপ গুনাহ বিদূরিত করে পবিত্র করে দেয়।

দোযখের শাস্তি হতে পরিত্রাণ : হাজ্জ দোযখের আগুন হতে পরিত্রাণ দেয়। মহানবী (স) বলেন: "আল্লাহ যাকে হাজ্জব্রত পালনের সামর্থ্য দিয়েছেন যদি সে হাজ্জ না করে ঐ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তা হলে সে দোযখের যন্ত্রণাদায়ক আগুনে পতিত হবে।"

হাজ্জব্রতী মহান আল্লাহর একান্ত সান্নিধ্য প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করতে পারে। ইহরাম, তাওয়াফ, তালবিয়াহ, নগ্নপদ, স্বল্প পরিচ্ছদ, প্রস্তর নিক্ষেপ, আরাফাতে অবস্থান, কুরবানী, মাথামুণ্ডন প্রভৃতি আনুষ্ঠানিকতা এর আধ্যাত্মিকতার অপরূপ নিদর্শনের পরিচয় বহন করে।

এককেন্দ্রমুখিতা : হাজ্জ মুসলমানদের এক ও অভিন্ন কেন্দ্রের অভিমুখী করে গড়ে তোলে। ব্যক্তি স্বার্থ, গোষ্ঠী, গোত্র, ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা, বর্ণ, ভাষা ইত্যাদির গণ্ডির উর্ধ্বে উঠে বিশ্বের সকল বিশ্বাসী মানবতা একই আল্লাহর ঘর কাবাতে এসে একাকার হয়ে এক অখণ্ড উম্মাহর অপরূপ নিদর্শন স্থাপন করে।

একক কেন্দ্রের অভিযাত্রীদের মধ্যে লক্ষ্যের অভিন্নতা স্বাভাবিকভাবেই সৃষ্টি হয়। উদ্দেশ্যের একাত্মা ও লক্ষ্যের অভিন্নতা সৃষ্টিতে হাজ্জ এর প্রতিটি দিক কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

মানুষ এ ধরণীতে আল্লাহর বান্দা ও তাঁরই খলীফা। আল্লাহর আইনের কাছে শর্তহীন আত্মসমর্পণ এবং আল্লাহ সারা জাহানের প্রতিনিধি হবার উপযোগী বৈশিষ্ট্য অর্জনের এক দুর্লভ সুযোগ করে দেয় হাজ্জের অনুষ্ঠানমালা।

মুসলিম হিসেবে, আল্লাহর বান্দা হিসেবে ও আল্লাহর খলীফা হিসেবে হাজীদের মধ্যে হাজ্জের অনুষ্ঠানমালা তীব্র দায়িত্বানুভূতির উন্মেষ ঘটায়।

নতুন চেতনা শক্তি : কাবা বিশ্বমানবতার হিদায়াতের কেন্দ্রবিন্দু। পৃথিবীতে এর অবস্থান মানব দেহে হৃদপিণ্ডের মতোই। হৃৎপিন্ড মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে রক্ত চুষে পরিশোধিত করে আবার দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়। তখনই মানব দেহ সুস্থ ও সবল হয়ে ওঠে, হয়ে ওঠে বলীয়ান, ঠিক একইভাবে প্রতি বছর কাবার আদর্শ বিশ্বের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে আল্লাহর বান্দাদের একই কেন্দ্রবিন্দুতে সমবেত করে। তাদের মনে সে ঈমানের আলো জ্বালায় যে ঈমানের আলো জ্বালিয়ে মানবতাকে চলার পথের সন্ধান দিয়ে গেছেন যুগে যুগে আল্লাহর প্রিয় নবী রাসূলগণ। দেহে হৃৎপিণ্ডের পরিশোধিত রক্ত প্রবাহের মত তারা নিজ নিজ এলাকা, দেশ ও জনপদে ফিরে যায় ঈমানের নতুন প্রেরণা আর সংগ্রামের নবতর চেতনা নিয়ে। এভাবে প্রতি বছর গোটা দুনিয়ায় মুসলিম জনপদ এক ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী চেতনায় জেগে ওঠে।

৬.৩ হাজ্জের সামাজিক শিক্ষা

হাজ্জের সামাজিক শিক্ষা অনেক। যথা-

একত্ববোধ জাগ্রত করে : হাজ্জের মৌসুমে সারা বিশ্ব মুসলিম ঐক্যবদ্ধ হয়ে হাজ্জের কার্যক্রম সম্পাদনের সময় মুসলমানদের মনে ঐক্যবোধ জাগ্রত হয় এবং জীবনেও এর প্রতিফলন দেখা যায়।

মুসলমান ভাই ভাই। হাজ্জের অনুষ্ঠান ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধনকে দেশের, ভাষার, বর্ণের সীমা ছাড়িয়ে আদর্শিক বিশ্ব ভ্রাতৃত্বে উন্নীত করে। হাজ্জের প্রতিটি কার্যক্রম পালনের মধ্য দিয়ে সারা বিশ্বের মুসলমানগণ একটি অখণ্ড ভ্রাতৃসংঘ ও এক উম্মাহ হিসেবে গড়ে উঠে।

ধনী-নির্ধন, রাজা-প্রজা, মনিব-ভৃত্য, কালো-সাদা মানুষ হাজ্জের সময় যখন সেলাইবিহীন একই কাপড় পরিধান করে সর্বময় ক্ষমতার মালিকের সামনে হাজির হয়- তখন এক অপরূপ সাম্যের দৃশ্যের অবতারণা হয়।

হাজ্জের মাধ্যমে বিশ্বমুসলিমের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান হয় ও মেলামেশার সুযোগ লাভ করে এবং পরস্পর সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়।

হাজ্জের অনুষ্ঠানমালা পালন করতে অসাধারণ শৃঙ্খলার পরিচয় দিতে হয়। সারা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মুসলিম হাজ্জের প্রতিটি অনুষ্ঠান তথা তাওয়াফ, সাফা-মারওয়ার দৌড়, আরাফাতের ময়দানে অবস্থান প্রভৃতি অনুষ্ঠান পালনের সময় এক অপূর্ব শৃঙ্খলা ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে পরিচয় দেয়।

হাজ্জ মানুষকে সহানভূতিশীল করে গড়ে তোলে। এক সাথে থাকার এবং অনুষ্ঠানমালা আঞ্জাম দেয়ার ফলে পরস্পরের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা অনুভব করতে শিখে। এভাবে সামাজিক জীবনে এর প্রভাব পড়ে এবং সহানুভূতিশীল হয়।

হাজ্জ বিশ্বমুসলিমের একটি বার্ষিক মিলন উৎসব। প্রতি বছর এ বিশেষ দিনে দুনিয়ার বিভিন্ন স্থান থেকে লক্ষ লক্ষ মুসলিম মক্কা মোয়ায্যামায় সমবেত হয়ে এ অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। এ মহাসম্মেলনে মুসলিমের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের সুযোগ পায়। পরস্পর ভাবের আদান-প্রদান ও সমস্যাদি সম্বন্ধে পরস্পরের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়ার সুযোগ হয়। ইসলাম বিশ্ববাসীকে একটি 'হেরেম' বা 'বালাদুল আমিন' বা 'শান্তির কেন্দ্রভূমি' দান করেছে, যা কিয়ামত পর্যন্ত শান্তির আহ্বান জানাবে। আর বিশ্বমুসলিম প্রতি বছর এ বাৎসরিক হাজ্জের অনুষ্ঠানে সমবেত হয়ে যে 'বিশ্বশান্তি সম্মিলন' করে এবং বিশ্বমানবতাকে ইসলামের শাশ্বত শান্তির পানে আমন্ত্রণ জানায়।

বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের পটভূমিকায় হাজ্জ : সাম্য মৈত্রী শৃঙ্খলা আর ঐক্যবোধের চূড়ান্ত নিদর্শন এ হাজ্জ। এ সম্মেলন ইসলামের বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ বিকাশের এক মোক্ষম সময়। ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং ইসলামী আদর্শ প্রচারের জন্য এর চেয়ে বিরাট সুযোগ আর কোন অনুষ্ঠানেই সম্ভব নয়। এ উপলক্ষে আরবি, আযমী, চীনা, জাপানী, ইউরোপীয়, আমেরিকান, ইরানি, ইরাকি, মিশরি, সুদানি, পাকিস্তানি, বাঙালি, হিন্দুস্তানি, তাতারি, তুর্কী, বর্মী, নিগ্র, সাইবেরীয়ান, মোঙ্গলস্ নাইজেরিয়ান ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষা-ভাষী বিভিন্ন সংস্কৃতির ধারক এক তওহীদে বিশ্বাসী মুসলিম সাদা-কালো-ধনী নির্ধন, উঁচু-নীচু, মনিব ভৃত্য নির্বিশেষে একই উদ্দেশ্যে একই স্থানে সমবেত হয়। সেখানে জাতিতে জাতিতে, বর্ণে বর্ণে, ভাষায় ভাষায় হৃদয়ে হৃদয়ে ঘটে সত্যিকার মিলন। ইহরামের একই পোশাকে সজ্জিত হয়ে ক্ষুদ্র আত্মাধোর সব রকমের ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে উঠে যায় সবাই। একে অন্যের দেশ, ভুগোল, ইতিহাস, তাহযিব, তামাদ্দুন, রাষ্ট্র সমাজ শিক্ষা অর্থনীতি সম্বন্ধে অবহিত হয়ে পরস্পর সমঝোতা ও সৌহার্দ্য সৃষ্টির সুযোগ পায়। ইসলামী তামাদ্দুন ও আদর্শকে দৃঢ় করার এর চেয়ে বড় সুযোগ কোন রাষ্ট্র বা 'তন্ত্র' কিংবা 'মতবাদ' এ পর্যন্ত দিতে পারেনি। জাতিসংঘ বিভিন্ন জাতি আর দেশ যা প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে, হাজ্জের মহাসম্মেলনে তার উদ্দেশ্য সব সফল হয়; অধিকন্তু মানবতার আধ্যাত্মিক সংস্কারের সুযোগ মিলে। একে অন্যের প্রতি অশ্রদ্ধা, হিংসা বিদ্বেষ, কলহ মনোমালিন্য, মতানৈক্য ভুলে গিয়ে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সুযোগ পায়। এদিক দিয়ে হাজ্জের সামাজিক ভূমিকার গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা অপরিসীম।

৬.৪ হাজ্জের অর্থনৈতিক শিক্ষা

হাজ্জের ধর্মীয়, সামাজিক গুরুত্ব যেমন ব্যাপক- এর অর্থনৈতিক ভূমিকাও তেমনি অনেক। যথা-

অর্থনৈতিক সাম্য : হাজ্জ মানুষকে মিতব্যয়ী ও সংযমী হতে শিক্ষা দেয়। হাজ্জ এক দিকে যেমন অর্থলি□/ ও কৃপণতা থেকে উদ্ধার করে উদার হতে শিক্ষা দেয়। তেমনি বিলাসিতা ও নিরর্থক অপচয় করা থেকে বিরত থাকতে শিক্ষা দেয়। শুধু দু'খণ্ড সেলাইবিহীন সাদা কাপড় পরা, খালি মাথায়, খালি গায়ে নেহায়েত সরল সহজ ধরনের চালচলনের মাঝে মিত্যবায়িতার শিক্ষা লাভ করা যায়।

হাজ্জ মানুষকে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীভূত করে সাম্যের পতাকা তলে সমবেত করে। আমীর-ফকীর, আশরাফ-আতরাফ, ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান ঘুচিয়ে একই কাতারে শামিল করে দেয়। হাজ্জের সময়ের এ সাম্যই পরবর্তীতে মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক সাম্য সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করে এবং অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

হাজ্জে গমন করে মানুষ দরিদ্রদেরকে দান খয়রাত করে থাকে। এ দান খয়রাতের মাধ্যমে তারা দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়। এটা বিশ্বের যে কোন মুসলিম ব্যক্তি ও দেশের জন্যও প্রযোজ্য হয়। এক দেশ অন্য দেশের দরিদ্র মুসলিম ভাইদের জন্য অর্থনৈতিক সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দিতে উদ্বুদ্ধ করে এ হাজ্জ।

বিশ্বমুসলিম অর্থ তহবিল গঠন : প্রতি বছর বিশ্বের লক্ষ লক্ষ বিত্তবান মুসলিম মক্কা নগরীতে হাজ্জ ব্রত পালনের উদ্দেশে গমন করে থাকে। তাতে 'আরব সরকার' ও সেখানকার জনগণের আর্থিক সচ্ছলতা আসে, প্রচুর আয় বৃদ্ধি পায়। সৌদি সরকার হাজ্জের আয় হতে বিভিন্ন গরিব দেশকে সাহায্য করে থাকেন। আর কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এমন অর্থ আয়ের সম্ভাবনা নেই।

তবে হাজ্জের আয় হতে যদি "বিশ্ব মুসলিম সংস্থা" সমবেত প্রচেষ্টার মাধ্যমে "বিশ্ব মুসলিম অর্থ তহবিল" গঠন করে বিশ্ব ব্যাংকের মতো বিরাট অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারত- তবে বিশ্ব মুসলিমের মহাকল্যাণ সাধন করতে পারত।

সারকথা

অবশেষে একথা সংশয়াতীতভাবে প্রমাণিত যে, হাজ্জ এমন একটি ইবাদাত, যার ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুরুত্বের তুলনা নেই। পৃথিবীর কোণে কোণে ইসলামের শান্তির বারতা পৌঁছানোর জন্য এতদপেক্ষা শক্তিশালী উপায় আর হতে পারে না। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা এ মহতী ইবাদাত অনুষ্ঠানকে সক্ষম বিশ্ব মুসলিমের উপর ফরয করে দিয়েছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ৮.৬

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন–

১. ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ কী?
   ক. যাকাত　　খ. সাওম
   গ. হাজ্জ　　ঘ. নামায

২. কার উপর হাজ্জ ফরয?
   ক. সুস্থ-প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি　　খ. সামর্থ্যবান-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি
   গ. মুসলিম নর-নারী　　ঘ. উল্লিখিত সকল গুণ বৈশিষ্ট্যের লোকদের উপর

৩. কুরআন মাজীদের বর্ণনানুসারে কে হাজ্জের প্রচলন করেন?
   ক. হযরত আদম (আ)　　খ. হযরত নূহ (আ)
   গ. হযরত মুহাম্মাদ (স)　　ঘ. হযরত ইবরাহীম (আ)

৪. কুরআন মাজীদে কা'বা ঘরকে বলা হয়েছে–
   ক. বাইতুল আতীক　　খ. বাইতুন নূর
   গ. বাইতুল মামুর　　ঘ. বাইতুল ফালাহ

৫. পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলার ইবাদাতের প্রথম গৃহ কোনটি?
   ক. কা'বা শরীফ　　খ. বাইতুল মুকাদ্দাস
   গ. বাইতুল মোকাররম　　ঘ. মসজিদে নববী

৬. হাজ্জের নির্দিষ্ট দিনগুলো ব্যতীত শরীআত নির্ধারিত পন্থায় কা'বা শরীফের তাওয়াফ করাকে বলে–
   ক. তাওয়াফ　　খ. জিয়ারত
   গ. উমরা　　ঘ. ঈদুল আযহা

৭. হাজ্জের ফরয কয়টি?
   ক. ০৫টি　　খ. ০৩টি
   গ. ০৭টি　　ঘ. ১৩টি

৮. শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক ইবাদাতের সমন্বয় কোন ইবাদাতানুষ্ঠান?
   ক. যাকাত　　খ. সালাত
   গ. সাওম　　ঘ. হাজ্জ

৯. কোন ইবাদাত করার ফলে মানুষ নবজাত ও শিশুর মত নিষ্পাপ হয়ে যায়?
   ক. ঈমান গ্রহণ করলে　　খ. হাজ্জ করলে
   গ. যাকাত আদায় করলে　　ঘ. সালাত আদায় করলে

১০. ইসলাম বিশ্ববাসীকে একটি এমন বস্তু দিয়েছেন যার মাধ্যমে কিয়ামত পর্যন্ত শান্তির আহবান জানাবে সেটা কি?

ক. হেরেম
খ. 'বালাদুল আমীন'
গ. কিবলা
ঘ. সব কয়টি একই উদ্দেশ্যে

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. হাজ্জের পরিচয় তুলে ধরুন।
২. হাজ্জ কখন থেকে প্রচলিত হয়েছে? হাজ্জের পটভূমি বিশ্লেষণ করুন।
৩. হাজ্জের ধর্মীয় গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন।
৪. হাজ্জের সামাজিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।
৫. হাজ্জের অর্থনৈতিক অবদানের তৎপর্য বিশ্লেষণ করুন।

চূড়ান্ত মূল্যায়নঃ ৮

বিশদ উত্তর মূলক প্রশ্ন

১. ইবাদাত কাকে বলে? মানব জীবনে ইবাদাতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করুন।
২. সালাত কী? সালাতের ধর্মীয় ও সামাজিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।
৩. যাকাতের পরিচয় দিন। যাকাতের ধর্মীয় গুরুত্ব লিখুন।
৪. যাকাতের সংজ্ঞা দিন। যাকাতের আর্থ-সামাজিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন।
৫. যাকাতের নিসাব বলতে কি বুঝায়? যাকাতের অর্থ ব্যয়ের খাতসমূহ কি কি? বিশ্লেষণ করুন।
৬. সাওমের সংজ্ঞা লিখুন। সাওমের ধর্মীয় ও সামাজিক শিক্ষা উপস্থাপন করুন।
৭. হাজ্জের পরিচয় ও পটভূমি লিখুন। হাজ্জের ধর্মীয় গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।
৮. হাজ্জের অর্থ কি? হাজ্জের সামাজিক ও অর্থনৈতিক শিক্ষা ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করুন।

নমুনা প্রশ্ন

ইসলাম শিক্ষা

দ্বিতীয় পত্র

কোর্স কোডঃ এইচএসসি-২৮০৭

সময়–৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান–১০০

ক বিভাগ–বিশদ উত্তরমূলক প্রশ্ন

(যে কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিন)

মান - ১২×৫ = ৬০

১। আল-কুরআন নাযিলের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করুন।

২। আল-কুরআনের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করুন।

৩। প্রথম মানব কে? তাঁর সৃষ্টির ইতিহাস লিখুন।

৪। হাদীস কাকে বলে? হাদীসের গুরুত্ব লিখুন।

৫। ফিক্‌হ কী? ফিক্‌হ শাস্ত্রের উৎস ও বিষয়বস্তু লিখুন।

৬। ইবাদাত কাকে বলে? মানব জীবনে ইবাদাতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করুন।

৭। অনুবাদ করুন ঃ–

١. الٓمّٓ

٢. ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَارَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

٣. اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ

٤. وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ

٥. اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

৮। অনুবাদ করুন ঃ–

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِىَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ وَاِقَامِ الصَّلَاةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ– (متفق عليه)

৯। অনুবাদসহ নিচের আয়াতটির শিক্ষা লিখুন ঃ–

صم بكم عمى فهم لا يرجعون

১০। অনুবাদসহ নিচের হাদীসটির শিক্ষা লিখুন ঃ–

لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين.

[পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

খ বিভাগ - সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

(যে কোন আটটি প্রশ্নের উত্তর দিন)

মান- ৫×৮ = ৪০

১১। সংক্ষেপে উত্তর দিন-

(ক) 'আল-কুরআনের' দশটি নাম লিখুন।

(খ) আল-কুরআনের বিষয়বস্তু কয় ভাগে বিভক্ত? লিখুন।

(গ) শানে নুযূল কি? এর গুরুত্ব লিখুন।

(ঘ) সূরা বাকারার আলোচ্য বিষয়ের সারকথা লিখুন।

(ঙ) সূরা বাকারায় উল্লিখিত কাফির-নাস্তিকদের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরুন।

(চ) الم (আলিফ-লাম-মীম) দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা করুন।

(ছ) হাদীস ও সুন্নাহ কাকে বলে?

(জ) কুরআন ও হাদীসের মধ্যকার পার্থক্যগুলো লিখুন।

(ঝ) সংজ্ঞা লিখুন (যে-কোন একটি)ঃ–

(ঞ) 'সিহাহ সিত্তাহ', 'মুত্তাফাকুন আলাইহি'।

(ট) ইজমা কাকে বলে? লিখুন।

(ঠ) ফিক্‌হ শাস্ত্রের মূল উৎস কয়টি ও কি কি?

(ড) ফিক্‌হ-এর প্রধান ইমাম কারা? তাঁদের নাম লিখুন।

(ঢ) সংজ্ঞা লিখুন (যে-কোন দুইটি) ঃ–

শরীআত, ওয়াজিব, সুন্নত, মুফতী।

(ণ) ইবাদত কাকে বলে? লিখুন।